Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2012 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 139-143
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বাংলাদেশে পানির সে কাল ও এ কাল

মো. জয়নাল আবেদীন*

পানির উৎস

পৃথিবীর চারভাগের তিন ভাগই পানি। মানবদেহেও তিন ভাগ পানি। পানি ছাড়া মানুষ, পশু-পাখি, সরি-সর্প, কীট-পতঙ্গ ও গাছপালা বেঁচে থাকতে পারে না। তাই পানির অপর নাম জীবন। পানি আমরা পাই প্রকৃতি থেকে। সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, হাওড়, জল-প্রপাত,ঝর্ণা প্রভৃতি পানির উৎস প্রকৃতিরই দান। আগে মানুষ পানীয়-জল নদ-নদী, খাল-বিল-পুকুর থেকেই সংগ্রহ করতো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে মানুষ প্রথমে কূপ খনন করে পানি সংগ্রহ শুরু করে। পরবর্তীতে গ্রামে নলকূপ খনন করে ও শহরে নদীর পানি শোধন করে পান করতো। বর্তমানে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা হচ্ছে।

পানির প্রধান উৎস সমুদ্র। ভূগর্ভস্থ পানি,হ্রদ,নদী, খাল-বিল-হাওড় পুকুর ও জলাধার হচ্ছে-পানির প্রাথমিক উৎস। এ সব পানি আসলে সমুদ্রেরই পানি। সূর্যতাপে বাস্ত হয়ে সমুদ্রের কোটি কোটি টন পানি উপরে মেঘ রূপে ভেসে বেড়ায়। এই মেঘ থেকেই বৃষ্টি হয়। আবার উঁচু পর্বতের গায়ে যে বরফ জমে তাও এই মেঘ থেকেই। বৃষ্টির পানি ও পর্বতের বরফ গলা পানিই পাহাড় বেয়ে নদী দিয়ে আবার সমুদ্রে পতিত হয়। এই পানিরই একটি ক্ষুদ্র অংশ সমতলের বিল-হাওড়, খাল, পুকুরে জমা হয়। যা দিয়ে শুষ্ক মওসুমে মানুষ নানা কাজ করে থাকে।

শিশু-কিশোর কালে দেখা পানি

আমার জীবনের শিশু ও কিশোরকালে বর্ষায় পানির যে রূপ দেখেছি তার তুলনা নেই। আমার জন্ম গ্রামে ও শিক্ষাজীবন কেটেছে গ্রামে। বিক্রমপুরের শ্রীনগরে। বিক্রমপুর বাংলাদেশের অন্যতম নিচু এলাকা। বর্ষাকালে পানিতে চারিদিকে টইটম্বুর রূপ ধারণ করে। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছি প্রায় প্রতি বছরই বর্ষাকালে বাড়ীর উঠান তলিয়ে যেত। বন্যা হলে ঘরেও পানি উঠত। দাদা-বাবা তখন এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়ার জন্য বাঁশ, কাঠ দিয়ে উঠানের উপর সাঁকো বেঁধে দিতেন। আমরা ছোটরা এই সাঁকোতে বসে পানি দিয়ে খেলতাম। বরশি দিয়ে মাছ ধরে মজা পেতাম। আষাঢ় মাসে জোয়ারের পানি আমাদের পুকুরে প্রবেশ করতো। কলকল ধ্বনিতে জোয়ারের পানি পুকুরে আসার দৃশ্য এখনও

* বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য (৭৯৫)।

হৃদয়ে অনুভব করি। পুকুর ভরে বর্ষার পানি যখন বাড়ীর সামনের পালানে কোমড় সমান হতো আমি তখন ছোট বোনটিকে নিয়ে ভাঙ্গা চিনির পেগুটের ছোট টুকরা পানিতে ফেলে ডুব দিয়ে তা দেখতাম। ছোট সে টুকরাকে মনে হতো স্বচ্ছ একখন্ড হীরক। পুরো বর্ষায় মায়ের সাথে ভাড়া করা কেরাইয়া নৌকায় যখন নানা বাড়ী বেড়াতে যেতাম তখন নৌকায় বসে আড়িয়ল বিলের পানির ১০/১৫ হাত নিচের জলজ উদ্ভিদ ও মাছ উপুর হয়ে দেখতাম। নৌকার বেগে পানিতে এক ধরণের শব্দ ও স্বচ্ছ বুদবুদের সৃষ্টি হতো- যা আমার কিশোর মনে গেথে আছে। আমার ছোট বেলায় ১৯৬২-৬৩ পর্যন্ত দেখেছি আমাদের বাড়ীসহ আশে-পাশের সব বাড়ীর লোকজন পুকুরের পানি মাটির কলসে ভরে এনে পান করতো। শুধু পার্থক্য দেখতাম আমার দাদা একটি বড় ফিটকিরির টুকরা তিন মাথা বিশিষ্ট একটি চিকন কঞ্চিতে বেঁধে তা কিছুক্ষণ কলসে ভিজিয়ে রাখতেন - তাতে পুকুরের পানির ময়লা কলসের নিচে গিয়ে জমা হতো। অন্য বাড়ীর সবাই ফিটকিরি ছাড়াই পুকুরের পানি পান করতো।

আশ্বিন-কার্তিক মাসের পানি ও কলেরা

বিক্রমপুরের বর্ষার পানি আশ্বিন-কার্তিক মাসে পঁচে যেত। আমন জমির ধান বর্ষার পানির সাথে পালগুা দিয়ে যত হাত পানি তত হাতের চেয়ে ২/৩ হাত উপড়ে উঠে যেত। আশ্বিন-কার্তিকে বর্ষার পানি নেমে যাওয়ায় আমন ধানও উপর থেকে নিচে নেমে আসতো। ধান গাছের বাড়তি নিচের অংশ(নাড়া) তখন পচে যেত। সম্ভবতঃ ধান গাছের এই পচন থেকেই পুকুরের পানিতে পচন লাগতো। তখন পুকুরের মাছ নিচ থেকে উপরে এসে মাথা নাড়তো। আমরা হাত দিয়েই তখন মাছ ধরতাম।

পুকুরের এই পঁচা পানি পানের ফলে প্রতি বছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে বিক্রমপুরের সর্বত্র কলেরার প্রাদুর্ভাব হতো এবং শত শত মানুষ অকালে প্রাণ হারাতো। আমাদের পুকুরের পশ্চিম পাড়ের ফজল সহ অনেক তরতাজা মানুষ কলেরায় মারা গিয়েছে। ড. হুমায়ুন আজাদ তাঁর ‘ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা’ কিশোর উপন্যাসে বিক্রমপুরে কলেরার চিত্র তুলে ধরেছেন। যাতে তাঁর ছোট ভাই আজাদের মৃত্যুর এক হৃদয় বিদারক বিবরণ দিয়েছেন।

কার্তিক মাসের পঁচা পানি ধান ক্ষেত থেকে ছোট ছোট খালের মাধ্যমে ‘শ্রীনগর-লৌহজং’ খাল ও ‘তালতলা-ডৌহরি’ খাল দিয়ে পদ্মা নদীতে গিয়ে নামতো। পুকুরের পঁচা পানি একটি বৃষ্টি হলেই স্বাভাবিক হতে শুরু করতো। বিক্রমপুরে কার্তিক মাসে কলেরা হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। তা হলো কাঁচা পায়খানা। আমার জানামতে একমাত্র মুন্‌শীগঞ্জ পৌরসভা ছাড়া সর্বত্র ছিল কাঁচা পায়খানা। পায়খানার বর্জ্য পানিতে মিশে নানা রোগ ব্যাধি ছড়াতো।

নদীর পানির সেকাল

বাংলাদেশের একমাত্র মাতামহুরি নদী ছাড়া সকল নদীর উৎস ভারতের পাহাড়-পর্বত। পর্বত-পাহাড় থেকে বয়ে আসা পানি নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশে সমুদ্রের লবণাক্ত পানিকে ঠেলে সমুদ্রের দিকে নিয়ে আমাদের জীব-বৈচিত্রকে রক্ষা করে আসছে হাজার বছর ধরে। গঙ্গা-পদ্মা-যমুনা-মেঘনা সহ সকল নদীর পানি এক অমূল্য সম্পদ। নদীই ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। নদী তীরেই গড়ে উঠেছে বন্দর, শহর। নদীর পানি সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে। ‘জাতের মাইয়া কালাও ভাল - নদীর পানি ঘোলাও ভাল’। অর্থাৎ ভাল মেয়ে ও নদীর পানি ছিল সমার্থক। নদীর পানিকে কেন্দ্র করে অববাহিকার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। মাছ ধরা, নৌ-পরিবহন, সেচ, গোসল,

রান্না-বান্নার কাজে নদীর পানির ব্যবহার আবহমান কাল থেকে। বিক্রমপুরের শ্রীনগরের জমিদার পরিবারেরস্নানের কাজে ব্যবহার হতো শীতলক্ষা নদীর পানি। বড় বড় দু'টি গয়না নৌকা নিয়োজিত ছিল জমিদার পরিবারেরানের জল শীতলক্ষা থেকে আনা-নেয়ার কাজে। পিতলের শতাধিক কলস ভরে এ জল নেওয়া হতো শীতলক্ষা থেকে। যা থেকে প্রমাণ মিলে যে শীতলক্ষা নদীর জল কত নির্মল ছিল। শ্রীনগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা পদ্মা। পদ্মার পানি ছিল ঘোলা। পদ্মার পানি খরস্রোতার কারণে তাতে থাকতো অনেক পলি। পদ্মার পানি প্রবাহিত শ্রীনগর-লৌহজং খালে কিশোর বয়সে বেশীক্ষণ ডুবালে শরীরের লোমে লোমে পলির আস্তরণ পড়ে যেত।

নদীর পানির একাল

১৯৬৯-৬০ সালে দাদির সাথে প্রথম ঢাকা বেড়াতে এসে বুড়িগঙ্গার পানি দেখেছিলাম স্বচ্ছ। বিক্রমপুরের বর্ষার পানির মতো পরিস্কার না হলেও অনেকটা পরিস্কার ছিল বুড়িগঙ্গার পানি। তখন ঢাকায় টেপের পানিই পান করা হতো। ১৯৭৪-৭৬ পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে অবস্থানকালেও আমরা টেপের পানিই পান করেছি। বুড়িগঙ্গার পানি শোধন করে তা উপরের টাঙ্গিতে তোলা হতো - যা পাইপ দিয়ে শহরের সর্বত্র পৌঁছে যেত। গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি তুলে তা সরবরাহের প্রথা চালু হয় সম্ভবত ১৯৭৮ সালের পর থেকে। নদীর পানি শোধণ করে তখন যে পানি সরবরাহ করা হতো তাতে বিঙচিং পাউডারের সামান্য গন্ধ নাকে ধরা পড়তো।

বর্তমানে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা, কর্ণফুলীসহ বাংলাদেশের প্রায় নদীর পানি বিক্রমপুরের আমন ধান চাষের আমলের কার্তিক মাসের পঁচা পানির রূপ ধরেছে। এসব নদীর তীরে গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানার অবিবেচক ও কান্ডজ্ঞানহীন মালিকেরা কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক বর্জ্যের শোধনাগার পণ্ডান্ট নির্মাণ না করে বর্জ্য ড্রেন দিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছে। যা ড্রেন বেয়ে নালায়, নালা বেয়ে খালে ও খাল বেয়ে

পত্রিকার নাম	তারিখ	রিপোর্টের শিরোনাম
দৈনিক সকালের খবর	০৬.১১.২০১১	'কাঁদো নদী কাঁদো' (আলী ঈমামের কলাম)
দৈনিক ইত্তেফাক	১৩.১১.২০১১	'না'গঞ্জের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপিত হয়নি ঃ নদীর পানি দুষিত'
দৈনিক যায় যায় দিন	১৩.১১.২০১১	আশপাশ এলাকার কল-কারখানা ও ট্যানারির বর্জ্য খাল দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে পড়ে পানি দুষিত করছে
দৈনিক সংবাদ	১৮.১১.২০১১	গুলশান-বারিধারা লেকের পানিতে বিষ ঃ লাখ লাখ মাছ পঁচে এলাকার পরিবেশ দূষণ ছড়াচ্ছে ঃ পরিবেশ অধিদপ্তর নির্লিপ্ত
দৈনিক সংবাদ	১৮.১১.২০১১	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১১ নদ-নদী ভরাট সৃষ্টি হচ্ছে স্থায়ী জলাবদ্ধতা ঃ বাড়ছে জনদুর্ভোগ
দৈনিক ইনকিলাব	২৩.১১.২০১১	বর্জ্যে নদীর পানি বিষাক্ত ঃ ভেসে উঠছে মরা-মাছ দুর্গন্ধে পরিবেশ নষ্ট
দৈনিক জনকণ্ঠ	০৪.০২.২০১২	পানি শূন্য হচ্ছে ঢাকা -১০ বছরে বিপর্যয়
দৈনিক প্রথম আলো	২৪.০২.২০১২	নোটিশ স্থগিতের সুযোগে দুই কারখানার নদী দূষন চলছে ঃ তরল বর্জ্যের শ্রোত ব্রক্ষ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যায়
দৈনিক কালের কণ্ঠ	২৮.০২.২০১২	পানি আলকাতরার মতো ! বিষের খাল !
দৈনিক কালের কণ্ঠ	০১.০৩.২০১২	শীতলক্ষ্যায় বিষের নহর। ভালুকা-গাজীপুরের শিল্পবর্জ্য অনিয়ন্ত্রিত
দৈনিক ডেসটিনি	২৭.০৯.২০১২	হালদায় বিষাক্ত বর্জ্য-সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা

নদীতে পড়ছে। ফলে খাল ও নদীর পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। এসব নদীর পানির মাছ, নদীর তলদেশের জলজ কীট-পতঙ্গ মরে গিয়ে জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে প্রাকৃতিক পরিবেশের সর্বনাশ করছে। গত বছর ট্রেনযোগে ঢাকা থেকে খুলনা যাওয়ার পথে কালিয়াকৈর এলাকায় একাধিক খালে কারখানার রঙ্গিণ রাসায়নিক বর্জ্য গড়িয়ে যেতে দেখেছি। আর বুড়িগঙ্গার পঁচা পানির দুর্গন্ধতো প্রতি সপ্তাহে বাড়ীতে যাওয়ার সময় বুড়িগঙ্গা সেতুতে উঠেই টের পাচ্ছি। আমাদের নদ-নদীর পানির মরণ দশার কয়েকটি উদাহরণ সাম্প্রতিক কালের পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট থেকে তুলে ধরছি। প্রায় প্রতিদিনই সকল খবরের কাগজে নদী, খাল, বিল, পুকুর ভরাট ও পানি দূষণের সচিত্র খবর প্রকাশিত হচ্ছে। ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াতেও প্রায়ই নদ-নদী, খাল-বিল দখল ও পানি দুষণের উপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। এভাবে নদীর পানি দুষণ পরিবেশ আইনে দন্ডনীয় অপরাধ।

নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা ভরাট ও দখল বাণিজ্য করে সারাদেশে এক শ্রেণীর অমানুষ কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে ধরাকে সড়া জ্ঞান করছে।

খাবার পানির ব্যবসা

আজ থেকে ৫০/৬০ বছর পুর্বে এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ পুকুর, নদী, খালের পানি পান করেই বেঁচে থাকতো। তখন প্রাকৃতিক পানি অনেকটা বিশুদ্ধ ছিল বলেই মানুষের তেমন অসুখ বিসুখ হতো না। বর্তমানে পার্বত্য এলাকার উপজাতিদের বেশির ভাগ পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার পানি পান করে থাকে। গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র টিউব ওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যাওয়ায় অগভীর টিউব ওয়েলের পানি পান নিরাপদ নয়। এ জন্যে গ্রাম গঞ্জে এখন অধিক পাইপযুক্ত আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল বসানোর কাজ চলছে। রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরের ওয়াসার পানি নানা কারণে না ফুটিয়ে পান করা নিরাপদ নয়। প্রতিদিন ওয়াসার পানি ফুটানোতে দেশে জ্বালানির কত অপচয় হচ্ছে-তা টাকার অংকে হিসাব করার সময় এসেছে। নিরাপদ পানির জন্য গত কয়েক দশক ধরে ঢাকাসহ সর্বত্র শুরু হয়েছে বোতলজাত পানির রমরমা ব্যবসা। মিনারেল ওয়াটার বলে বাজারজাত করা বোতলের পানির বেশির ভাগই গভীর নলকূপের পানি। দেশের অনেক গ্রামাঞ্চলে বোতলজাত পানির মুল্য খাঁটি দুধের চেয়েও বেশি। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বিভিন্ন ওয়াটার ফিল্টার পানি কতটুকু বিশুদ্ধ করে তা পরীক্ষা করে দেখারও সময় এসেছে। অতি সম্প্রতি আমি এক আত্মীয়ের মাধ্যমে কুষ্টিয়ায় নির্মিত 'সনো ফিল্টার' সংগ্রহ করে তাতে পানি না ফুটিয়ে পরিশোধিত করে পান করছি। জানা মতে 'সনো ফিল্টার' আন্তর্জাতিক মানের। এ ফিল্টার সুলভ মূল্যে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া দরকার। আমাদের মনে রাখা দরকার পানিতে অনেক প্রাকৃতিক উপাদান থাকে যা ফুটালে নষ্ট হয়। তাই পানি না ফুটিয়ে 'সনো ফিল্টার' জাতীয় ফিল্টারের মাধ্যমে পান করাই শ্রেয়।

ঢাকা শহরে পানির বিপর্যয়

রাজধানী ঢাকা প্রতিনিয়ত পানি শুন্য হচ্ছে। প্রতি বছর ৩ মিটার করে পানির স্তর নিচে নামছে। নগরীর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সমুদ্র স্তর থেকে ১৭০ ফুট নিচে নেমে যাওয়ায় ঢাকার ভূগর্ভস্থ পানি নোনা পানি অনুপ্রবেশের হুমকির মুখে পড়েছে। রাজধানীর ৮৭ ভাগ পানির সরবরাহের উৎস ভূ-গর্ভস্থ পানি। শতভাগ পানি ভূ-উপরিভাগ থেকে সরবরাহের ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নেবে। সম্প্রতি ঢাকা শহরের সকল পুকুর শুকিয়ে যাওয়ার যে সচিত্র প্রতিবেদন দৈনিক সংবাদ পত্রে ছাপা হয়েছে-তা এই মারাত্মক পরিস্থিতিরই পুর্বাভাস বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত রেখেছেন।

চলতি বছরে গ্রীষ্ম না আসতেই ঢাকা নগরীতে দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সংকট। দিন দিন এ সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। কোথাও কোথাও সারাদিনেও মিলছে না পানির দেখা। পানি পেলেও তা থেকে আসছে দুর্গন্ধ, লালচে ও ময়লাযুক্ত পানি, যা পান করা তো দূরের কথা ব্যবহারেরও অযোগ্য। এ পানি ব্যবহারে পেটের পীড়া, ডায়রিয়া, আমাশয়সহ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকে।

বিশুদ্ধ পানির নামে বোতলজাত পানি বাণিজ্য চলতে থাকলে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় এই পানির নিয়ন্ত্রণ যদি বেসরকারি খাতে চলে যায় তবে হু হু করে তা উচ্চমুল্যে চলে যাবে, যা সামাজিক বিশৃংখলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের দেশের যেখানে ৬০ ভাগ লোক অতিদরিদ্র। সেই ক্ষেত্রে পানি বাণিজ্যিক খাতে চলে গেলে মুল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি প্রতিকূলে চলে যাবে।

পানির নাম জীবন

পানি ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না। পান করার জন্য এবং গৃহস্থালীর প্রায় প্রতিটি কাজেই দরকার হয় পানির। শিল্প-কারখানা পানি ছাড়া অচল। পানি জীবন ধারণের আবশ্যিক উপাদান। এ উপাদানটি দুষিত হলে জীবন ধারণের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে,এটাই স্বাভাবিক। আপাত দৃষ্টিতে পানি স্বচ্ছ মনে হলেও সব ধরণের পানি বিশুদ্ধ নয়। মানবদেহের ক্ষতিকর রোগ-জীবাণু ছাড়াও পুকুর এবং কুয়ার পানিতে এমন কিছু রাসায়নিক, খনিজ পদার্থ, জীবাণু ও দুষিত গ্যাস থাকার ফলে পানি পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও আশঙ্কাজনক হারে নলকূপের পানিতেও আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে, যা এক ধরনের বিষ। তাই বিশুদ্ধ পানির এক নাম জীবন।

পানির নাম মরণ

পানি যেমন জীবন আবার তা মরণেরও কারণ হয়। পানীয় জল বিশুদ্ধ না হলে নানা রোগে মৃত্যু ঘটে। নদী, নালা, খাল, বিলের পানি যদি কল কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য দ্বারা দূষন করা হয়-তা'হলে সে পানি হয় মানুষ,পশু পক্ষি ও কীট পতঙ্গের জন্য মরণ। তা ছাড়াও জলোচ্ছাস, বন্যা ও নদী ভাঙ্গন পানির কারণেই হয়ে থাকে। এ সবের ফলেও জীবন ও সম্পদ হানি হয়।

আমাদের দায়িত্ব

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের শেষ দিকের লাইনে আছে 'মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন, ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি'। বাংলাদেশের বড় বড় শহর সংলগ্ন নদ-নদীর পানি শিল্প বর্জ্য ও অন্যান্য কারণে দুষিত হয়ে বাংলা মায়ের বদন মলিন করে দিয়ে আমাদের নয়ন জলে ভাসার অবস্থায় নিয়ে এসেছে। পানি বিশুদ্ধ রাখার জন্য কাজ করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আমাদের এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে পুকুর, ডোবা, নালা, খাল, বিল ও নদীর পানি দূষিত হয়। কল-কারখানার মালিকদের এ ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতি কালকারখানায় তা ছোট হোক-বড় হোক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করতে হবে। কোন কলকারখানার বর্জ্য যদি ডোবা, নালার মাধ্যমে নির্গত হয়ে পানি পরিবেশ দূষন করে-তা হলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেওয়া যাবে না।